Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বাদেশিকতা

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রওশন আরা
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.8
Pages	২০১-২১০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বাদেশিকতা

রওশন আরা*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের কবিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন কবি শামসুর রাহমান। তাঁর কবিতা অনেকটা তিরিশের কাব্য-ঐতিহ্যের অনুবর্তন। পঞ্চাশের দশকের কবিতার রোমান্টিকতার ধারাকে তিনি তাঁর কবিতায় স্বাগত জানিয়েছেন। ধীরে ধীরে কবিতায় রোমান্টিক প্রেমচেতনা থেকে কবি নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রামীণ মানব-সংস্কৃতির পরিবর্তে নগর-মধ্যবিত্ত মানব-সংস্কৃতি তাঁর কবিতার মূল অবলম্বন ছিল। বরাবরই তিনি নাগরিক চেতনাকে কবিতার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে মানবিকতাই ছিল তাঁর কবিতার আরাধ্য বিষয়। এই প্রবন্ধে কবির স্বদেশ ভাবনার স্বরূপ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের কবিতায় পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)। পঞ্চাশের দশক বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিনির্মাণ দশক। তিরিশের কবিরা যে দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় চৈতন্য স্থাপন করে সমাজ, সময় ও সভ্যতালগ্ন হয়েছিলেন, দেশ-বিভাগ পরবর্তী কবিতায় সেই অনুভূতিময় প্রকাশ অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে। চল্লিশের দশকের নবোদ্ভূত প্রগতিবাদী ও জীবনলগ্ন কাব্যধারাও দেশ-বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাষ্ট্রাদর্শের পশ্চাদ্‌গতি প্রভৃতির প্রতিক্রিয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পঞ্চাশের কবিরা তিরিশের কবিতাকে তাঁদের কাব্য-ঐতিহ্যরূপে ধারণ করেছেন এবং সমকালীন আধুনিকতার সাথে এই কাব্যধারাকে সংযুক্ত করেছেন। ১৯৪৭–এ ভারত বিভক্তির পর পূর্ববাংলার সকল ক্ষেত্রেই অবাঙালি পাকিস্তানি গোষ্ঠী হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা থেকে শুরু করে ১৯৬০ সাল অবধি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদমন করতে থাকে। ফলে পূর্ববাংলা একদিকে যেমন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়; অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দ্বান্দ্বিকতার সৃষ্টি হয়। চল্লিশের দশকের বুদ্ধিজীবীশ্রেণি আবহমান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানবিকতা

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, জহুরুল ইসলাম সিটি, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পান। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানে কতকগুলো সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন – যা ছিল প্রগতিচিন্তা বহির্ভূত। এভাবে প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে সেই সাম্প্রদায়িক শ্রেণির চিন্তা ও মতের বিরোধ দেখা দেয়। 'পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-বাংলার কবিতা চেতনাগত দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে প্রধানত দুটি ধারায় – এক : পাকিস্তানি বা ইসলামি ভাবধারায়; দুই : মানবতাবাদী বা দায়বদ্ধ ধারায় (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৫ : ২৩০)। সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বলে প্রগতিপন্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে মর্যাদাবান আসনে অধিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজন করে কবিতায় অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিকতার উন্মেষ ঘটান।

এ ছাড়াও পঞ্চাশের দশকের নব্য কবিদের পথচলা সম্প্রসারিত হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার দৃঢ়মূল স্থাপনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে হাসান হাফিজুর রহমানের '*নতুন কবিতা*' সংকলনটি। এই সংকলনের কয়েকজন কবিই পরবর্তী সময়ের প্রধান কাব্যধারা নির্মাণে পুরোধার দায়িত্ব পালন করেছেন। পূর্ব বাংলার কাব্যের সাম্প্রতিক সুরটির ব্যাপ্তিকাল ১৯৫০-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত। জীবনানন্দ, ত্রিশের কবিতা এবং সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনের উত্থান-পতনমুখর এই সময়পরিধিতেই আমাদের কাব্যসাহিত্যে অন্তত একজন কবি সমগ্র পটভূমিকে সার্থকভাবে আত্মস্থ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন; তিনি শামসুর রাহমান। (হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৭৩ : ২৯৫, ৩০০) পঞ্চাশের দশকের কবিতায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কবির শিল্প সচেতনতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছে সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা ও সাময়িক বাস্তবতা।

শামসুর রাহমান তিরিশের আধুনিক বাংলা কবিতা এবং এলিয়ট-উত্তর আধুনিক ইঙ্গ-মার্কিন কবিতাকে তাঁর প্রধান আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের ভাবনাকে গ্রহণ করেই কাব্যচর্চায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের কবিতার প্রেক্ষাপটে যা ছিলো সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ অভিনব, নতুন। সমগ্র বাংলা কবিতার পটভূমিতে শামসুর রাহমানের কবিতা হচ্ছে প্রধানত তিরিশের কবিতার সম্প্রসারণ মাত্র। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম বাংলার কবিতায় দেখা দিচ্ছিল নব্য-রোমান্টিক ধারা, শামসুর রাহমানও এরই ধারাবাহিকতায় প্রবেশ করলেন বাংলা কবিতায়। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কাব্যজগতে যে রোমান্টিকতার ধারা বইছিল, শামসুর রাহমান নিজে সেই ধারাকে স্বাগত জানিয়েছেন। 'প্রথম পর্যায়ে মেদুর, স্বপ্নকুহকময়, নিভৃত নস্টালজিক চেতনা তাঁর কবিতায় ভাষারূপ পায়। আবাল্য নাগরিক কবি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় নগরকেই আরাধ্য করে তুললেন।' (বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, ২০০৮ : ২৬-২৭) বস্তুত 'শামসুর রাহমান হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম কবি যাঁর কবিতায় ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন, একটি বিশেষ জনপদ, শহর, মানুষ, দেশ এবং এর সমস্ত ক্লেদ, সন্তাপ, নৈঃসঙ্গ্য, যন্ত্রণা, বিষাদ, আতঙ্ক,

আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত হতে চেয়েছে।' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৫ : ২৩৯) ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার নেতিচেতনা থেকেই শামসুর রাহমানের কবিতায় বিষাদ, মৃত্যুচিন্তা, ক্ষুব্ধতা, নেতিবোধ উদ্ভূত। তাঁর *'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'* কাব্যগ্রন্থের কবিতায় জীবনে প্রবেশের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রথম মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় জীবন লাভের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যেনো জীবনে প্রবেশের; তাঁর কবিতা জীবন বহিরিস্থিতের, জীবন অভ্যন্তরে প্রবেশের ও জীবন দ্বারা মথিত হওয়ার গাঁথা। জীবন বহিরিস্থিত মাত্রই রোমান্টিক, যার বুকে ভরে অপার্থিব রূপ-সৌন্দর্য, আবেগের জ্যোৎস্না; আর চারপাশের প্রতিবেশ পার্থিব অসুন্দরের অন্ধকার।' (হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৭৩ : ৩৪)

হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি
অলস মৌমাছিদের
পাখা গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
('রূপালি স্নান'/প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

অর্কেস্ট্রা-ক্রন্দসী পর্বের বৈরীসমাজ, ব্যর্থসমাজ, জড়বাদে অনুরাগ, নাস্তিকতা, মৃত্যুর পটভূমিতে জীবনের নশ্বরতা আকৃষ্ট করে তাঁকে। নৈঃসঙ্গ্যস্পৃহা, নিখিলনাস্তি, শূন্যতা, ধূ ধূ মরুভূমির বন্ধ্যাত্ব, ছায়াহীন ঊষর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নির্বাকনীল নির্মম মহাকাশ' এর প্রতীকে উদ্ভাসিত; শামসুর রাহমানেও আছে তার রূপ। হতাশা ও বিবমিষা সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে *'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'* কাব্যের বিরস গান, কোনো একজনের জন্যে, একান্ত গোলাপ, খাদ, নক্ষত্র-বিন্দুর জন্যে, সেই ঘোড়াটা – এই ধারার কবিতা। (মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি, ২০০৪ : ১৬৩)

এতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত,
আহত পশু অনুভবে ছেঁড়াখোঁড়া।
দুর্গন্ধ ভরা গুহায়িত রাত নিষ্ফল ক্রোধে দীর্ণ,
(কোনো একজনের জন্যে/প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

কবির প্রথম কাব্যে রোমান্টিক প্রেমচেতনাবোধ প্রাধান্য পেয়ে থাকলেও 'নাগরিক জীবনের কল্পনাতেও শামসুর রাহমান পরিচয় দিয়েছেন অভিনবত্বের। তিনি যে ঢাকার বর্ণনা দিয়েছেন সেই ভাবনায় বোদলেয়ার বা এলিয়টীয় কল্পনার ছোঁয়া থাকলেও এর মূল ভিত্তি হচ্ছে শান্ত নিস্তরঙ্গ এক মফঃস্বল শহর।' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৫ : ২৩৮)। যেখানে তিনি নিজেকে নিজের মত করে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তাঁর ভাবনায় দেখা যায় শাহরিক ছাপ–

নগর শিয়রে রোজ সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের ছবি
রং ঢালে, প্রজ্জ্বলিত হয় দিনলিপি।...

ঝরায় বর্ষায় জল প্রথামতো আষাঢ় শ্রাবণ,
পথ চলি আশার উল্লাসে।
('১৩৫৭-এর একটি দিন'/ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

শামসুর রাহমান নাগরিক চেতনাকে যে কবিতার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেন তার কারণ ত্রিবিধ : প্রথমত, বস্তুপৃথিবীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, কেননা তিনি ছিলেন এই শহরেরই আবাল্য অধিবাসী; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতা এতে হয়ে উঠতে পেরেছিল মূল তিরিশের নাগরিক কবিতা কিংবা বিশ্বকবিতার সমীপবর্তী এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতার শরীর থেকে তিনি ঝরিয়ে দিতে চাইছিলেন অনাধুনিক গ্রামীণতার অপবাদ। শামসুর রাহমান বুঝেছিলেন আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু আত্ম-আবেগের সঙ্গে পরিপার্শ্বের কোনো মিল খুঁজে পান নি তিনি। কেননা নাগরিকতা বা পাশ্চাত্যের আধুনিকবাদের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত ছিল না বাংলাদেশে। মানবিকতাই ছিল তাঁর আরাধ্য বিষয়, ফলে ভেবেছেন অতিক্রম করে যেতে হবে নেতিবোধকে। পঞ্চাশের পর্বে এই ঊর্ধ্বায়িত কাব্যচেতনার প্রেরণাতে তাই রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে। (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৫ : ২৩৯)

আস্তাবলের ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিঃষ্কম্প স্তব্ধতা,
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিংখোরের মতো, মাঝে মাঝে শুধু
ফোলা পা নাড়ছে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।
('সেই ঘোড়াটা' / প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

শামসুর রাহমানের প্রথম পর্যায়ের কবিতা চেতনা ও প্রকরণের দিক দিয়ে ত্রিশোত্তর কবিতার ছায়াপটে নির্মিত। এ পর্বের কবিতায় বোদলেয়ার বা এলিয়টীয় এবং জীবনানন্দীয় কাল্পনিকতা ও স্পন্দন অনুভূত। 'জীবনানন্দ তাকে দিয়েছেন বিষণ্ন মনোবিশ্ব-কবিতার রুপোলি অন্তর্লোক; তাই জীবনানন্দীয় বিষাদ কুয়াশা, নৈসর্গিক পত্র পল্লব, স্বপ্নগ্রস্ত ভূভাগ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন কবিতায়।' (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৮: ৪৯) তাঁর কবিতায় সমাজস্বভাবের স্থাপনে তিনি নিজস্ব কবিভাষা নির্মাণ করেছেন –

কাল সারা রাত ছায়া-অন্ধকার প্রতি পলে পলে
মোমের শিখার মতো ইচ্ছা তার জ্বলেছিল এই
ভোরকে পাওয়ার। চোখে ছিলো
গাঢ় প্রার্থনার ভাষা, বুকে
('তার শয্যার পাশে'/ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ '*রৌদ্র করোটিতে*' রচনাকালীন সময়ে ঢাকা শহর ও মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সাধনায় এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হয়। সে সময়ের মধ্যবিত্ত মানস নানারূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ কাব্যের কবিতায় ঢাকা

শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলেখ্যই নির্মিত হয়েছে; যেখানে তিনি নিজস্ব ভাবনায় স্বদেশকে নির্মাণ করেছেন –

নই আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে-
তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে রাজা, কেন
দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ডুগডুগি
বাজিয়ে শোনাবো কথা, নাচাবো বানর ফুটপাতে?
('আত্মপ্রতিকৃতি' / রৌদ্র করোটিতে)

শামসুর রাহমানের প্রথম দিকের আত্মগত জীবনদর্শন পরবর্তী সময়ে সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হলো। 'ষাটের দশকে আমাদের জীবনে একটা স্থবিরতা নেমে এসেছিল, একটা অভিশাপকে আমরা মেনে নিয়েছিলাম, শুধু মেষ হয়েই আমরা ক্ষান্ত হইনি, হাতির শুঁড়ের মুখোশের আড়ালে লুকায়িত একটা পশুশক্তির বশ হয়েছিলাম আমরা, জীবনের মূলধন করেছিলাম আত্মবঞ্চনা'। (সাজ্জাদ আরেফিন, ২০১০ : ৩৬৭) যা কবির ভাষায় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে এভাবে–

ঐরাবতের খেয়ালখুশির ধন্দায়
ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়
প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে।
যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে।
('হাতির শুঁড়' / রৌদ্র করোটিতে)

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের উত্তালময় স্বদেশের এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমানের এ শ্রেণির কবিতাবলি ঐ সময়ের বিশ্বস্ত দলিল; যেখানে নেকড়ে-হায়েনার মতো আইউবি শাসন, নিষ্পেষণের কথা উঠে এসেছে–

এ দেশে হায়েনা, নেকড়ের পাল,
গোখরো, শকুন, জিন কি বেতাল
জটলা পাকায় রাস্তার ধারে।
জ্যান্ত মানুষ ঘুমায় ভাগাড়ে।
('কৃতজ্ঞতা স্বীকার'/ রৌদ্র করোটিতে)

মানুষের জীবনযাপনের এক একটি মুহূর্ত, বিশেষ করে সেই ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত নানা বৃত্তে আবর্তিত হয়; তেমনিভাবে কবি শামসুর রাহমানের হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সারাক্ষণ 'আমি'কে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। যা কবি নিজেকে স্বদেশের এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত করেছেন চিন্তা-চেতনায় ও কবিতায় –

আমি কে? কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে?
কেন যাই চিত্র প্রদর্শনী, বারে, বইয়ের দোকানে,
তর্কের তুফান তুলি বুদ্ধিজীবী বন্ধুর ডেরায়?
না, তারা জানে না কেউ। ('আত্মপ্রতিকৃতি' / রৌদ্র করোটিতে)

আমরা লক্ষ করেছি, প্রাক-একাত্তর সময়ে সামরিক শাসনাধীন রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশ দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়। কবি তাঁর কবিতায়-'বিধৃত করেছেন ঘাতক সময়ের বিবরণ, যুদ্ধোত্তর দাঙ্গা ও মর্মান্তিক স্বাধীনতা এবং নেতাদের চরিত্রহীনতা'। (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৮ : ৫৮) আইউবি শাসনের কূটজালে পতিত হয়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত কবির স্বদেশ-মাতৃকা। কবি স্বদেশের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে এবং স্বৈরশাসক থেকে মুক্তি পেতে এমন এক নেতৃত্বের প্রত্যাশা করেন; যাঁর স্বদেশ-চেতনাবোধ হবে নির্ভেজাল এবং স্বদেশের আকুতি থাকবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে :

যৌবন দুর্ভিক্ষ বিদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভাঙ্গে দেশ,
এদিকে নেতার কণ্ঠে নির্ভেজাল স্বদেশী আকুতি
ভাষা খোঁজে আদর্শের ভরাডুবি মহাযুদ্ধ শেষে
মঞ্চ তৈরি : কে হবে নায়ক তবে? করি কার স্তুতি?
('নিরালোকে দিব্যরথ'/ দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে)

সামষ্টিক দেশচেতনা, দৈনন্দিনতা, মধ্যবিত্তের পরাজয়, সমষ্টির সংকট, গণ-আন্দোলন, অভ্যুত্থান, স্বাধীনতার তীক্ষ্ণ জটিল সংগ্রামে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে শামসুর রাহমানের কাব্যজগত। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যেই লুকানো রয়েছে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।

সূর্যের লাল মুখের ওপর আজ
অসাধ্য বটে দরজা বন্ধ করা।...
নিজেকে প্রবোধ দেয়ার খেয়ালে মেতে
আঙুলে নাচাবো অলীক মড়ার খুলি?
('আত্মপ্রতিকৃতি'/ রৌদ্র করোটিতে)

'নিজ বাসভূমে' কাব্যের পটভূমি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান; এখানে কবির স্বাদেশিকতাবোধ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের এক ভিন্ন আঙ্গিকতায় পূর্ণ। তিনি এ পর্যায়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমীপবর্তী হয়ে উঠেছেন। বায়ান্ন সালের পর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলল। গণ-আন্দোলনের সময় সমস্ত জাতিসত্তার জাগরণকে কবি তাঁর কবিতায় শিল্পিত করেছেন এভাবে –

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট

উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় ।...
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা ।
('আসাদের শার্ট' /শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠকবিতা)

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের সীমানা অতিক্রম করে কবির গভীর জীবনবোধ নির্মিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের প্রেরণা শক্তি সমকালীন নানা আন্দোলন। তাছাড়া হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্রবিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। আবেগে ও মেজাজে ঐ সময় তিনি অনেকের মতো অনেকটা জনতার কাছে এসে পড়েছিলেন, কারণ সময়টা ছিল ভয়ানক বিক্ষুব্ধ এবং আত্মমগ্নতার বেড়িবাঁধ তখন সবদিকেই ভেঙে পড়েছে। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ১৯৭৬ : ২৮) তাই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় –

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।
যুদ্ধের আগুনে,...
সৃষ্টির ফাল্গুনে
হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
('নিজবাসভূমে'/বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)

সত্তরের দশকের সবচেয়ে আলোড়িত ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। দেশের এই ক্রান্তিকালে চুপ থাকা কবির পক্ষে দুরূহ। তাঁর মানবিকচেতনায় দেশের মানুষের ওপর শাসকগোষ্ঠীর দমন, উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মননধর্মী লেখা গর্জন করে উঠে। স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে থাকতে চান না তিনি। 'স্বাধিকার আন্দোলনে আলোড়িত রাহমানের কবিতা; যার বীজ প্রোথিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের চেতনায়। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং প্রার্থিত স্বাধীনতার অভাবে কবিকে আবারো কলম ধরতে হয়'। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ১২-১৩) স্বাধীনতাকে তিনি আহ্বান করলেন এভাবে –

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে...
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।...
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের ওপর।
('তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা'/ বন্দী শিবির থেকে)

'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশের কবিরা ছিলেন পাকিস্তানি ঘাতকদের অন্যতম শিকার। সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও বাংলাদেশের কবিরা সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেছেন, পালন করেছেন তাঁরা শব্দ-সৈনিকের ভূমিকা। একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে শোনিতাক্ত শব্দে আমাদের কবিরা বাণীবদ্ধ করে রেখেছেন তখনকার আপন অনুভূতি।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ১৭)

দিনে-দুপুরেই জীপে একজন তরুণকে কানামাছি করে
নিয়ে যায় ওরা;
মনে হয় চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।
বেয়নেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষায় ভাসে;
('সন্ত্রাসবন্দী বুলেটবিদ্ধ দিন-রাত্রি'/বিজয় দিবস সংখ্যা)

সাম্প্রতিক ও সমকালীন কবি শামসুর রাহমান বরাবরই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত। সত্তরের শেষের দিকে দেখা যায়, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ মূল্যবোধের শোচনীয় পরিণামের জন্য তাঁর লেখনীতে ভিন্ন রূপ পরিগৃহীত হয়েছে। এ পর্যায়ে স্বাধীনতা-বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষ করে কবি উচ্চারণ করেছেন :

কতবার আমরা চালান হয়ে গেছি
গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রে শ্বাপদের
মতো অন্ধকারে, আমাদের বেচে দেয়...
ফ্যাসীবাদীদের মুখোমুখী। ফুল আর জ্যোৎস্না দিয়ে
বেপরোয়া ঘাতকের সঙ্গে আজ লড়াই করবো।
('বর্ণমালা দিয়ে গাঁথা'/ সে এক পরবাসে)

এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার আগেই ঘাতকের অশুভ ছায়া হানা দেয় স্বদেশ বাংলায়। বাংলাদেশের মহানায়ক, স্বাধীনতার স্থপতি, বাংলার অন্যতম রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে আবারো স্বাধীনতাবিরোধীদের উত্থান ঘটে এ বাংলায়। পঁচাত্তরের এই হত্যাকাণ্ডে শোকাহত কবি শেখ মুজিবকে ইলিয়াড মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র অ্যাগামেমননের তেজস্বিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে কবি ইলিয়াডের মহাকাব্যিক পটপ্রেক্ষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। (শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ, ২০১০ : ২৩৭) অ্যাগামেমননকন্যা ইলেকট্রার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার মানসিক স্পৃহার

সাথে শেখ হাসিনার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞার স্বপ্নের সংযোগ সাধিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর পাকহানাদারদের কবল থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এ দেশের মানুষের মুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পথে-প্রান্তরে তাঁর গুণকীর্তন, দেশপ্রেমিকের জয়মাল্য খচিত স্বপ্নবান মানুষটির জীবনে নেমে এল ট্রাজিক পরিণতি :

নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে
গরিয়ান এক প্রাসাদের মতো বিপুল গেলেন ধসে।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।
নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।
(ইলেকট্রার গান/ইকারুসের আকাশ)

শামসুর রাহমানের কবিতায় দেশসচেতনতা, সমাজসচেতনতা জনগণকে পৌঁছে দিয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। পঞ্চাশের দশকের কবি হয়েও সময় পরিক্রমায় পঞ্চাশোত্তর যে আত্মসংকট তা তাঁর কবিতাকে করেছে জীবনঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর কাব্যের উপজীব্য বিষয় দেশের সংকট, শাসকশ্রেণির শোষণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রাম। নব্বইয়ের দশকে এসে শামসুর রাহমান জনতার সংলগ্ন হয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করেছেন। এ সময়ের অগ্রপথিক নূর হোসেনের আত্মত্যাগ স্বদেশ মাতৃকার মহিমায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে এভাবে–

সবার অলক্ষ্যে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে
আঁকা হয়ে যায়, যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গনে।
উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং
হঠাৎ শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা,
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়; ('বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'/ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়)

শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বাদেশিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কবির নাগরিক মননে কেবল নাগরিকচেতনাই প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়, বরং সমগ্র দেশের সমাজসচেতনতা জনগণকে পৌঁছে দিয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। তিনি পঞ্চাশের দশকের কবি হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশোত্তর সমস্যা-সংকট তাঁর কবিতাকে করেছে জীবনঘনিষ্ঠ। ষাটের দশকে পাকিস্তানি শোষকের কূটজালে এক রকম হতাশা, নৈরাশ্যের মধ্যে পতিত হয় কবির স্বদেশ। একদিকে উনসত্তরের

গণঅভ্যুত্থানে আসাদের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী সত্তরের নির্বাচনে পূর্ববাংলার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা; এ সবকিছুই কবির মনে এক অন্যরকম অনুভূতির সৃষ্টি করে। এভাবেই স্বদেশের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে রূপান্তরিত হতে থাকে কবির স্বাদেশিকভাবনা। সত্তরের দশকে স্বাধীনতা, দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কবির চিন্তাজগতে সমৃদ্ধ মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু আশির দশকে স্বৈরাচারের কবলে পড়ে অর্জিত স্বাধীনতা ধ্বংসের কাছাকাছি চলে আসে। কবি এ সময়ের কবিতায় তাদের বিরুদ্ধে রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বদেশের স্বপ্ন নির্মাণে সচেষ্ট হন এবং স্বৈরশাসক থেকে মুক্তি পেতে শহীদ নূর হোসেনের আত্মত্যাগকে স্মরণ করেন। এছাড়া স্বদেশের সমস্যা-সংকট, নানাবিধ কর্মপন্থায় কবির ছিল একান্তযোগ; যা তাঁর লেখনীতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৭৬)। *শব্দের সীমানা*, মুক্তধারা, ঢাকা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৮)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৫)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি (২০০৪)। *বাংলাদেশের কবিতা উত্তরাধিকার ও স্বরূপ (১৯৫২-১৯৭১)*, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৩)। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠকবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (১৯৯৯)। *শামসুর রাহমান রচনাবলী-১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পাদিত] (২০১০), *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শামসুর রাহমান (১৯৭৯)। 'সন্ত্রাসবন্দী বুলেটবিদ্ধ দিন-রাত্রি', *সচিত্র সন্ধানী*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ঢাকা

সাজ্জাদ আরেফিন [সম্পাদিত] (২০১০)। *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা : চার, অক্টোবর, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৭৩)। *আধুনিক কবি ও কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা